বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন–শিক্ষা–সরকারি ব্যয় বরাদ্দ: একটি বিশ্লেষণ[১]

ড. আবুল বারকাত

সারকথা: বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বাংলাদেশকে গভীর এক সংকটে ফেলেছে। এমনই সংকট যেখানে সংবিধানের জনকল্যাণকামী বিধানসমূহ বাস্তবায়নের পরিবেশ ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে চরম বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতি: একদিকে প্রবল ক্ষমতাধর-প্রভাবশালী ১০ লাখ, আর অন্যদিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ যারা বঞ্চনা-লাঞ্চনার ফাঁদে বিপন্ন; সুযোগের-দারিদ্র যাদের নিত্য সঙ্গি। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ) এ জনগোষ্ঠি যে জীবনকে মূল্যবান মনে করে সেই জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। বিপন্ন এ মানুষের প্রকৃত শিক্ষা সুযোগ নেই বললেই চলে; আর প্রকৃত জ্ঞানার্জন-কাঠামোটি নিজেই বিপন্ন। শিক্ষার নির্বিচার বাজারিকরণ ও নির্বোধ পণ্যায়ন এ বিপন্নতা বৃদ্ধি করছে। বিপন্নতা রোধে একমুখী সার্বজনীন সৃজনশীল শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রের বর্ধিত মনোযোগের বিকল্প নেই। সেই সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজার-অন্ধত্ব নিয়ামক হবে না'কি দেশের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদের লাভ-ক্ষতির বিবেচনা প্রসূত রাষ্ট্রীয় ভূমিকা থাকবে– বিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরি। অন্যান্য জরুরি বিষয়ের অন্যতম হতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে জনকল্যাণ-বিরুদ্ধ অনুন্নয়ন খাতের ব্যয়-বরাদ্দে যথেষ্ট ছাড় দিতে হবে। বিষয়টির সুরাহা জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক-প্রতিশ্রুতি ছাড়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন

প্রকৃত উন্নয়ন বলতে আমি বুঝি স্বত্তাধিকার থেকে সক্ষমতায় রূপান্তর (from entitlement to capability) - এর একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom-mediated)। যে প্রক্রিয়ায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়: অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুযোগ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা, এবং সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা। এ অর্থে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে (politico-economic criminalized structure) এদেশে মানুষের সক্ষমতা অর্জনের বিষয় হিসেবে শিক্ষার প্রসঙ্গটি মৌলিকতম। তা এ কারণে যে মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারায় বাংলাদেশ আজ এক গভীর আর্থ-রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত, যে সংকট বর্ধিত হারে সংকট-পুনরুৎপাদন (extended reproduction of crisis) করে চলেছে, যেখান থেকে উত্তরণ ব্যতীত বঞ্চনাক্লিষ্ট ব্যাপক জনগোষ্ঠির (১৪ কোটির মধ্যে ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ) জন্য পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না; হবে না মানুষের সক্ষমতা অর্জন। আর্থ-রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ বোঝা যায় নিচের দশটি মাপকাঠি দিয়ে যেগুলো একই সাথে সংকটের কারণ ও ফলাফল; এবং এসবের মিথস্ক্রিয়া দেশকে গুরুতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সংকটের এই স্বরূপ উন্মোচন প্রয়োজন এ জন্য যে শিক্ষাসহ উপর-কাঠামোর সবকিছুরই নিয়ামক দিক নির্দেশক (ব্যারোমিটার) হ'ল এগুলি। সংকট নির্দেশকগুলি নিম্নরূপ:

১. অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক হরিলুট সংস্কৃতি যা মানুষের সক্ষমতা অর্জন প্রক্রিয়ার সরাসরি প্রতিবন্ধক)।

২. কালো টাকার আধিপত্য (বাৎসরিক ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা)।

৩. মানব উন্নয়নের পেছনে ব্যয়কে সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার প্রদান, বিপরীতে অনুৎপাদনশীল খাতে (যেমন সামরিক খাত ও প্রশাসন) বরাদ্দকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার প্রদান।

---

[১] জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত "বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন–শিক্ষা–সরকারি ব্যয় বরাদ্দ: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গোলটেবিলে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ২১ এপ্রিল, ২০০৫

৪. সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে জাতীয় সম্পদের বিপুল অপচয় ।

৫. পুঁজির সবচেয়ে বাজে (কমিশন-দালাল পুঁজি) রূপটির আধিপত্য, যা উন্নয়ন বিরোধি ।

৬. জবাবদিহিতাবিহীন ব্যাংকিং খাত (অপরিশোধিত ঋণ ২০ হাজার কোটি টাকা) এবং অদক্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (অর্থনৈতিক বিকৃতি ও দুর্বৃত্তায়ন প্রণোদনার শক্তিশালী সহায়ক) ।

৭. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিনিয়োগের স্বল্পতা (প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগসহ) ।

৮. গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিঃস্বকরণ ও ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ।

৯. সরকারের উচ্চমাত্রায় ঋণ করার প্রবণতার কারণে তারল্য সংকট ।

১০. নগরায়নের পরিবর্তে বস্তিয়ায়ন (slumization and not urbanization) ।

মানব উন্নয়নে বৈপরীত্যটা বাংলাদেশে মাত্রাতিরিক্ত । কারণ উপরোল্লিখিত বাস্তবতার বিপরীতে আমাদের সংবিধান বলছে “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ” (অনুচ্ছেদ ৭(১); “রাষ্ট্র – একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অর্থনৈতিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, ... আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” (অনুচ্ছেদ ১৭ ক,গ); “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ,..... এবং শিক্ষা ... উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” (অনুচ্ছেদ ১৬); “ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন । মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” (অনুচ্ছেদ ১৯ (১) (২)) । কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী । বাস্তবতা হ’ল সরকার বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষেত্রে “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ”-এর কাছে সাংবিধানিক এসব দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যান । একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় না; আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর হয়নি; সুযোগের সমতা, মানুষে মানুষে অসাম্য বিলোপ ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন – এসব ক্ষেত্রে উল্টোটা খালি চোখেই ধরা পরে । আর এসবই যখন একটুও অর্জন হয়নি তখন শিক্ষায় ব্যাপক জনগোষ্ঠির অভিগম্যতা (people’s access to education) বৃদ্ধির কোনো হেতু থাকতে পারে না ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার বাজারিকরণ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়বস্তু মানুষ, তারা যে জীবনকে মূল্যবান মনে করে সেই জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রাযুক্তিক অগ্রগতি এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এগুলো লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয় । এসব মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখে কিনা তা নির্ভর করবে এগুলো মানুষের পছন্দ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে কিনা, মানুষের জন্যে এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে কিনা যে পরিবেশে মানুষ তাদের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে । তাই মানুষের পছন্দের বিস্তৃতি ঘটানোর মূল নীতি হল মানুষের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো: মানুষ যতদূর পর্যন্ত করতে পারে তার বা যা হতে পারে সেটিই তার সক্ষমতা । মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক যে সক্ষমতা সেটা হল একটি দীর্ঘ এবং সুস্থ্য জীবন যাপন করা, শিক্ষা লাভ করা, একটি ভদ্রজনোচিত জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাপ্যতা লাভ করা এবং কমিউনিটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া । মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করা বলতেও বোঝায় যে, তারা স্বাধীন হবে এবং যেসব আইন ও প্রতিষ্ঠান মানুষকে শাসন করে সেগুলো তৈরী ও তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণ করতে পারবে । যে দরিদ্র মানুষটি তার সন্তানকে স্কুলে

পাঠাতে পারে না, মাঠে-বাজারে-রাস্তাঘাটে-মানুষের বাড়ীতে কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হয়- সে মানুষটি মানব উন্নয়নের ছোঁয়া পায়নি। যে দারিদ্রের কারণে উপযুক্ত মেধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত সে সাংবিধানিকভাবেই (নৈতিকভাবেও) বিপন্ন মানুষ। এজন্যই বলছি, প্রকৃত মানব উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠতার অর্থ হলো অ-স্বাধীনতার (unfreedom) প্রধান উৎসগুলো তিরোহিত করা। অ-স্বাধীনতা হল: দারিদ্রের পাশাপাশি স্বৈরাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের স্বল্পতার পাশাপাশি লাগাতার শিক্ষা বঞ্চনা থেকে সবধরণের সামাজিক বঞ্চনা, সার্বজনীন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি নিপীড়ক রাষ্ট্রের অসহিষ্ণুতা বা মাত্রাতিরিক্ত তৎপরতা। এ দেশে কিছু মানুষের ধনসম্পদের নজিরবিহীন বৃদ্ধি সত্ত্বে অধিকাংশ মানুষকেই মৌলিক স্বাধীনতার অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। কখনও কখনও বস্তুগত স্বাধীনতার অভাব সরাসরি অর্থনৈতিক দারিদ্রের কারণ হয়ে ওঠে যা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি, পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগাড়, নিরাময়যোগ্য রোগবালাই দূর করা, পর্যাপ্ত বস্ত্র, আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা বা বিশুদ্ধ পানি বা স্যানিটারি সুবিধা অর্জনের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। অন্যদিকে আবার নাগরিক সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক যত্ন যেমন মহামারি প্রতিরোধ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাংগঠনিক উদ্যোগ বা স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অনুপস্থিতির প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে ওঠে অ-স্বাধীনতা।

বস্তুত, মানুষ যা অর্জন করতে পারে তা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং সুস্বাস্থ্য, মৌলিক শিক্ষা ও উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিপরীত ক্ষেত্রে এসব সুযোগ-সুবিধার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনও আবার প্রভাবিত হয় মানুষের স্বাধীনতার চর্চা, সামাজিক বাছাই, এবং এসব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ সিদ্ধান্তে অংশ নেয়ার অধিকার প্রভৃতির দ্বারা। বহিস্থ, বিপন্ন ও বঞ্চিত মানুষ– যারা এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ– তাদেরকে উন্নয়নের কেন্দ্রে 'স্থাপন'-এর (inclusion of the excluded -অর্থে) জন্য এসব আন্তসম্পর্কের স্বীকৃতি জরুরি। অধিকারভিত্তিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সত্যিকার মানব উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো হল লাগাতার ও মহামারীর আকারের বঞ্চনার অবসান এবং ভয়াবহ নিঃস্বতা প্রতিরোধ, যা বস্তুগত স্বাধীনতার অভাব থেকে উৎপন্ন হয়। এখানে, যেমনটা আগেও বলা হয়েছে, স্বাধীনতা বলতে ৫টি উপকরণগত স্বাধীনতার সবকটিকেই বোঝায়।

অর্থনীতির বিকাশে বাজারের ভূমিকা অস্বীকার করবো না। কিন্তু একথা তো ধ্রুব সত্য যে জীবনযাত্রার মানের গুরুত্ব সুস্থ-সুন্দর জীবন-যাপনের মধ্যে, পণ্যের আহরণে নয় (পণ্য মাধ্যম মাত্র)। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কথা নির্ভেজাল সত্য। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "বাজার অর্থনীতিই একমাত্র দাওয়াই নয়। সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিবন্টন নিয়ে কাজ করছে কি'না সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। .... যেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অত্যন্ত কম বলে এখনও দেশে ব্যপক নিরক্ষরতার হার, শিশু মৃত্যুর হারও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশি সেখানে রাষ্ট্রকে – বাজারের অর্থনীতির বাইরে যেতে হবে" (অমর্ত্য সেন, ২০০২)। এক্ষেত্রে জোসেফ স্টিগলিজের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টেকসইকরণ নির্ভর করে ঐসব কর্মকাণ্ডের সামাজিক অভিঘাতের উপর" (স্টিগলিজ, ২০০২)।

জ্ঞান পণ্যায়িত (commoditization of knowledge) হতে পারে না। অথচ আমাদের দেশে দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে শিক্ষার পণ্যায়ন হয়েছে অবারন্ত। শিক্ষা এখন এমন মাত্রায় পণ্যায়িত হয়েছে যখন উচ্চ শিক্ষিতেরা জ্ঞানী হিসেবে পূঁজনীয় হচ্ছেন না, হচ্ছেন এক ধরণের জ্ঞান-খাটো আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি। প্রি-স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা – কোথাও একই পদ্ধতির গণমুখী শিক্ষা বলতে কিছু নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান-তৃষ্ণা (appetite for learning) মেটানোর বিষয়টি এখন গৌণ। জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা আর আদৌ সমার্থক নয়। শিক্ষা এখন আর জ্ঞানার্জন-সংশ্লিষ্ট নয়। জ্ঞান বলে যদি কিছু থেকেও থাকে তা এখন বাজারের অধীন (subordinate to market)। সংকীর্ণ বাজারের। সুতরাং শিক্ষা বলে কিছু একটা আছে (আমরা যে যেভাবে দেখছি), তবে নির্মোহ জ্ঞান চর্চা বলতে শিক্ষার পরিমণ্ডলে তেমন কিছু নেই। বাজার এ ক্ষেত্রে, তিন দশকে, এমন একটি

ব্যালান্স শিট সৃষ্টি করেছে যেখানে জ্ঞান-জগতে যা কিছু বৃদ্ধি পেলে মানুষের মানুষ হওয়া নিশ্চিত হতো তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে; আর যা হ্রাস পেলে সবার জন্যই মঙ্গল হতো তা হ্রাস পায়নি, বৃদ্ধি পেয়েছে (ছক ৪)।

ছক ৪: জ্ঞান ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট তিন দশকের প্রবণতার খেরোখাতা

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
ব্যক্তি মালিকানাধীন (প্রাইভেট) বাণিজ্যিক-ভিত্তিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ক্যাডেট, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; জ্ঞান-ভিত্তি প্রসারণের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি; বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস	দেশজ সংস্কৃতি চর্চা ; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ

মাত্রাতিরিক্ত বাজারিকরণ ও রাষ্ট্রের সংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে আমাদের দেশে এখন সকল স্তরের শিক্ষা এক সংকীর্ণ গণ্ডির দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে (যেমনটি হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি)। যে দুষ্টচক্রে আর যাই হোক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন হবার নয়। সেই মূল লক্ষ্যটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনানুযায়ী হল: "মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফুরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সাথে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞানবোধ কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞান প্রয়োগে জীবনে সম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা ও প্রসার"। শিক্ষার এসব মূল লক্ষ্যের সাথে আমাদের বাণিজ্যিকিকৃত শিক্ষার কোনো সম্পর্ক কেউই স্থাপন করতে সক্ষম হবেন না- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সরকারি বাজেট- একটি মৌলিক প্রশ্ন

রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণে যা নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (সংবিধানে) আর সরকার যা করে- এ দু'য়ের বৈপরীত্য ও বিরোধ নির্দেশের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র আমাদের বাজেট। স্বাধীনতা উত্তর তিন দশকের বিকাশ-প্রকৃতি এ দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যে ফাঁদ সৃষ্টি করেছে সেখানে এ বৈপরীত্য ও বিরোধ স্বাভাবিক; সহজাত বটে। অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হবে আর বাজেট- উন্নয়ন অথবা রাজস্ব যেটাই হোক না কেন- হবে দুর্বৃত্ত বিরোধী, জনকল্যাণমুখী- তা প্রকৃতি বিরোধী। তা কল্পনাতীত এ কারণেও যে সরকারি (২০০৩-০৪ অর্থবছরের) বাজেট হয়েছে ৫১,৯৮০ কোটি টাকার কিন্তু কালো টাকা সৃষ্টি হবে কমপক্ষে ৬০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ। এ এক দুর্বোধ্য বৈপরীত্য।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান। সংবিধানের বিধান বলছে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হল সংবিধানে বর্ণিত "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ" (অনুচ্ছেদ ৭.১) তাদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। আমরা এখন পর্যন্ত এমন কি কর্মকৌশল অবলম্বন করেছি যা দিয়ে বলা যায় যে জনগণের প্রতি নিম্নলিখিত সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব সরকারি বাজেট নিশ্চিত করবে; বাজেটে এমন কি আছে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে দেশের ৯০% ক্ষমতাহীন মানুষের ক্ষমতায়ন (inclusion of the excluded অর্থে) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে:

এক. ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি মানুষই তো সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"তে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১১, ১৩ - ২০ অনুযায়ী বঞ্চিত, ক্ষমতাহীন, দুর্দশাগ্রস্ত। PRSP, Millenium Developlment Goal, পঞ্চবার্ষিক ও ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে এসব কথার উল্লেখ আছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাজেটের সাথে এসব বঞ্চনা-দুর্দশা দূরীকরণের কোনো যোগসূত্র নেই।

দুই. আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬-৭ কোটি; মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে সে সংখ্যা ৮-১০ কোটি (এ অবস্থা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। বাজেট এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কি বলছে?

তিন. সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় তিন কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে)। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীকরণে বাজেটের স্পষ্ট প্রস্তাবনাটি কি?

চার. প্রায় আট কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)। কার্যকর সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে এবং শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে বাজেট কিভাবে কাজ করবে?

পাঁচ. প্রায় নয় কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। স্বাস্থ্য বাজেট দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কিভাবে ভূমিকা রাখবে?

ছয়. সারা দেশে প্রতিবছর ছয় লাখ মানুষের মৃত্যু। এর অর্ধেকই পাঁচ বা তারও কম বয়সের শিশু। আরও দুঃখের কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় প্রয়োজন মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা (যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে)। সে চিকিৎসাও ব্যপক মানুষের জোটে না। (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)। বাজেটে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের কৌশলটা কি?

সাত. প্রায় এগার কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)।গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে বাজেটারী কৌশলটা কি?

আট. সীমিত আয়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত। বেকারত্ব এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে বলে সে দুর্দশাও বাড়ছেই। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদে-র সঙ্গে সাযুজ্যহীন)। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে বাজেটের সক্রিয় ভূমিকা রাখার কথা– তা কিভাবে নিশ্চিত হবে?

নয়. দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীরা নিশ্চিতভাবেই হতদরিদ্র ও বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। বিশাল হতদরিদ্র এ জনগোষ্ঠির বঞ্চনা লাঘবে বাজেটের কৌশলসমূহ কি?

দশ. বিরাট এক জনগোষ্ঠি ক্রমশ বেশি মাত্রায় নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন। খুন, ধর্ষণ, মাস্তানি-রাহাজানি এবং মহিলা ও শিশুদের প্রতি সকল ধরণের নির্যাতনসহ নিরাপত্তাহীনতার সকল কারণই বাড়ছে। কমছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা (এসবই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খাতে প্রচুর অর্থবরাদ্দ ধরা হয়েছে, কিন্তু এ বরাদ্দ কিভাবে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে– তার দিক নির্দেশনা কোথায়? শিক্ষার চেয়ে বন্দুক কি জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বেশি ভূমিকা রাখে? নীতি নির্ধারকেরা এ বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী নন কেন?

এগার. ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী হচ্ছে। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য– সবদিক থেকেই প্রান্তস্থ (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ; অবশ্য আদিবাসী সত্ত্বা সংবিধানে স্বীকৃত নয়)। বাজেট এ জনগোষ্ঠির প্রান্তীয় অবস্থান কিভাবে দূর করে সামগ্রিক দারিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে?

এসব বঞ্চনা থেকে মুক্তি যদি রাষ্ট্রের "সাংবিধানিক রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি" হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সরকারের ৫১,৯৮০ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেটে[২] এমন কি কৌশল, এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মপদ্ধতিসহ কালো অর্থনীতির ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ-সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা বলেছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে সরকার জনগণের প্রতি সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। যেহেতু এক্ষেত্রে বৈপরীত্য ও বিরোধ ছাড়া অন্য কিছু দেখছিনা সেহেতু আমার উপসংহার হ'ল সরকারের বাজেট সংবিধানে বর্ণিত জনকল্যাণ-এর সাথে যোগসূত্র স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

আমার এ উপসংহার সঠিক এজন্য যে, আমরা খোলা চোখেই দেখছি– একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন এবং দুর্দশা-বঞ্চনা ক্রমবর্ধমান; আর অন্যদিকে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি।

সরকারি বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দঃ মানব কল্যাণ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থিওডর সুলজ, গ্যারি বেকার ও অমর্ত্য সেনের মতে[৩] শিক্ষা ও স্বাস্থ্য টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাদের মতে শিক্ষা- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জ্ঞান-ভিত্তি সৃষ্টি করে; শিক্ষা মানব পুঁজি গঠনের কেন্দ্র-ভিত্তি; শিক্ষা মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম। স্বাস্থ্য মানব পুঁজির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু; স্বাস্থ্য ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান কর্তৃক বিশ্বব্যাপি জরিপে সারাবিশ্বের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলে 'সুস্বাস্থ্য'-কে প্রধান চাহিদা হিসেবে প্রকাশ করেছে (Millennium Poll, UN 2000)। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার Commision on Macroeconomics and Health স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চিরাচরিত ধারণা 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে'- চ্যালেঞ্জ করে উল্টোটা বলছে যে, 'দরিদ্র দেশে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত'।

প্রকৃত অর্থে সংবিধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানব কল্যাণ দর্শন বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতির মাত্রা কতটুক, তা বিচারের জন্য স্বাধীনতাত্তোর তিন দশকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মানব উন্নয়ন নির্দেশক খাত সমূহের পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, নিরাপত্তা খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণ জরুরি। উন্নয়নের মূল ধারায় `inclusion of the excluded' ব্যাপারটিকে কে কিভাবে দেখেছে, এ বিশ্লেষণ তারও ইঙ্গিত দেয়।

---

[২] যার মধ্যে আছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০,৩০০ কোটি টাকা), (অনুন্নয়ন) রাজস্ব ব্যয় (২৮,৯৬৯ কোটি টাকা), বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভুত প্রকল্প (৩৯০ কোটি টাকা), নীট মূলধনি ব্যয় (১,২৮০ কোটি টাকা) ও খাদ্য বাজেটের নীট ব্যয় (১,০৪১ কোটি টাকা)।

[৩] বিস্তারিত দেখুন, Schultz T.P. 1981. Economics of Population, N. Y.; Becker.G.S. 1981. A Treatise on Family, Harvard University Press; Sen. A. K. 1999. Development as Freedom, N.Y.; WHO. 2001. Macroeconomics and Health : Investing in Health for Economic Development (Jeffrey D. Sachs, Chairman, Commission of Macroeconomics and Health).

সর্বশেষ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৩৬,১৭১ কোটি টাকা (৮০ শতাংশ কর রাজস্ব, ২০ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব)। আর রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮,৯৬৯ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৪৯৯৭ কোটি টাকা বেশি। খাতওয়ারি রাজস্ব ব্যয়ক্রম নিম্নরূপ:

সর্বোচ্চ ব্যয় হবে 'সুদ' খাতে (৬৪৬৭ কোটি টাকা); পরবর্তী ক্রম- জনপ্রশাসন (৫৮২১ কোটি টাকা), শিক্ষা ও প্রযুক্তি (৪১৮৮ কোটি টাকা), প্রতিরক্ষা (৩৫৩৪ কোটি টাকা), জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা (১৯৩৪ কোটি টাকা), পরিবহন ও যোগাযোগ (১৭৩৩ কোটি টাকা), স্বাস্থ্য (১৪১০ কোটি টাকা), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (১২০৭ কোটি টাকা), কৃষি (৯৮৩ কোটি টাকা), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৮৩৫ কোটি টাকা)। অনুন্নয়ন ব্যয়ের ২৬ শতাংশ যাবে বেতন-ভাতা বাবদ, ২১ শতাংশ সুদ, ১৫ শতাংশ সাহায্য-মঞ্জুরী, ১৪ শতাংশ পণ্যসেবা, ৬ শতাংশ পেনশন, ৪ শতাংশ ভর্তুকি ইত্যাদি। গত বছরের তুলনায় এ বছরে সব খাতেই অনুন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে। এ হল অর্থমন্ত্রী রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ হিসেবে সংসদে যা পেশ করেছেন তার আপাত: সার কথা। প্রকৃত মর্মকথা ভিন্নতর।

প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয় বিষয়টি রাষ্ট্রীয় 'টপ সিক্রেট'। প্রতিরক্ষা খাতের ঘোষিত ব্যয় আসলে এই খাতের মোট ব্যয়ের খণ্ডিত অংশ। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ বিভিন্ন বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম ও স্থাপনাসমূহের পিছনে সরকারি ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হিসেব পাওয়া অসম্ভব। এমনকি সরকারি বাজেটের শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, গণপূর্ত খাত, খাদ্য বাজেট, ঋণ পরিশোধ খাত, 'অন্যান্য' ইত্যকার নানান খাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের ব্যয়-বরাদ্দ। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের তথ্যও 'টপ-সিক্রেট'। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, ১৯৭২ সালকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে ২০০৪ সালে এসে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আয়তন ন্যূনপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা এবং আয়তন বৃদ্ধি থেকেও তা সহজে বোঝা যায়।

উপযুক্ত তথ্যহীনতার মধ্যেও বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে একথা বলা সম্ভব যে, আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত গতি রুদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে ইউ এন ডি পি-সহ দক্ষিণ এশিয় মানব উন্নয়ন রিপোর্টে প্রদত্ত কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

- ১৯৮৫ থেকে ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৮ শতাংশ (US$ ৩৪১ মিলিয়ন থেকে ৫৪০ মিলিয়নে)— যেখানে একই সময়ে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ২৫ শতাংশ,
- ১৯৮৫-২০০১ কালপর্বে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৪.০ শতাংশ (যে হার পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার হারের চেয়ে বেশি),
- প্রতি ১ হাজার ডাক্তারের বিপরীতে ৬ হাজার সেনা সদস্য,
- প্রতি এক হাজার শিক্ষকের বিপরীতে ৩০০ সেনা সদস্য, এবং
- ১৯৭২ থেকে অদ্যাবধি রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় 'দেখানো' হয়েছে, তা শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চেয়ে বেশি এবং স্বাস্থ্য (জনসংখ্যাসহ) খাতের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি।

১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে এক লাখ ৫৭ হাজার ৯৩ কোটি টাকা যেখানে শীর্ষ স্থানে আছে সাধারণ প্রশাসন (১৯.৯%), দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে প্রতিরক্ষা (১৭.৬%), তৃতীয় স্থানে শিক্ষা ও ক্রীড়া (১৭.৫%, শুধু শিক্ষা নয় ক্রীড়াসহ শিক্ষা যেখানে শিক্ষা বাজেট জনগণের শিক্ষার লক্ষ্যে ছিল কিনা তা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে), চতুর্থ স্থানে ঋণ পরিশোধ (১২.৬%, যে ঋণের ৭৫% জনগণের কাছে পৌঁছেনি), পঞ্চম স্থানে পুলিশ ও বিচার (৮.২%), এবং ষষ্ঠ স্থানে অন্যান্য (৫.৮%, যার ব্যাপকাংশ কোনও অর্থেই মানব উন্নয়নমুখী নয়)। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, রাজস্ব বাজেটে আসলে প্রতিরক্ষার অবস্থান শীর্ষস্থানে। শিক্ষা

বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার অংশ, ক্রীড়া বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার অংশ, স্বাস্থ্য বাজেটে প্রতিরক্ষায় নিযুক্তদের অংশ, ঋণ পরিশোধের (সুদ) সঙ্গে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্টতার অংশ– এসব কোনোভাবে আলাদা করে দৃশ্যমান প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করলে তা ১৭.৬ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশে উন্নিত হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতটিই হবে রাজস্ব বাজেটের প্রকৃত সর্বশীর্ষ খাত। উল্লেখ্য যে রাজস্ব বাজেটে এখন প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান বরাদ্দ শিল্প খাতের বরাদ্দের তুলনায় ২৭ গুণ বেশি, কৃষির তুলনায় ৩.৬ গুণ বেশি, স্বাস্থ্যের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি।

গত তিন দশকে মোট রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান অংশ ছিল ১৭.৬ শতাংশ। দৃশ্যমান এই হারটি প্রত্যেক আমলে আগের আমলের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে: ১৯৭২/৭৩-১৯৭৫/৭৬-এ (বঙ্গবন্ধুর চার বছর) ১৪ শতাংশ, ১৯৭৬/৭৭-১৯৯০/৯১ (জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের ১৫ বছর)-এ ১৭ শতাংশ, ১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬ (খালেদা জিয়ার ৫ বছর)-এ ১৭.৮ শতাংশ, ও ১৯৯৬/৯৭-১৯৯৯/০০ (শেখ হাসিনার ৫ বছর)-এ ১৮.১ শতাংশ। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বাজেটেও এ ধারা বহাল আছে। আমাদের দেশে মানববঞ্চনার যে চিত্রটি আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি, তা সঠিক হলে জনগণের অপার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং/অথবা জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর ভিত্তি দূর্বল না হলে এবং/অথবা দুর্বৃত্তদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পেলে বাজেটে প্রতিরক্ষার দৃশ্যমান অংশ এভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৯.৪৮ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পর্যন্ত তা মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১১.৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ ঐ বছরগুলোতেই পাকিস্তান-প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহে আত্মীকৃত করা হয়েছিল। ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ এক লাফে ১৯.৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা এবং তদপরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সমর-প্রভুদের ক্ষমতা দখল ঐ ব্যয় বরাদ্দ উল্লম্ফনের পেছনে প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের প্রকাশ্য হিস্যা এক বছরে ১১.৩ শতাংশ থেকে ১৯.৬ শতাংশে বেড়ে যাওয়া কোনো সাধারণ উল্লম্ফন নয়। সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ার এ নাটকীয় পরিবর্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। পরবর্তী বছরেই ঐ ব্যয় বরাদ্দ আরও বেড়ে ২২.৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। স্বৈরাচারী সরকারের ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরের ২২.৭ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ 'প্রকাশ্যে' প্রতিরক্ষা বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ রয়ে গেছে আজ অব্দি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সিভিলিয়ান সরকারের মেয়াদ পূর্তির তেরো পনের পেরিয়ে এসেও প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের সংকোচন সম্ভব হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানোর ভীতি হয়তো বা নির্বাচিত সরকারগুলোকে আতংকিত করে চলেছে। প্রশ্ন হল, সরকার যদি জনগণ কর্তৃক জনগণের স্বার্থেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে সামরিক অভ্যুত্থান ভীতি কেন?

প্রতিরক্ষা খাতে 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্য উন্নয়ন বাজেট ব্যয় হয় সেটাও 'টপ সিক্রেট'। এমনকি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির মাধ্যমেও সে বিষয়ে কোনো কিছুই জনগণকে জানানো হয় না। বিষয়টি যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই যে, যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করছি তার সঙ্গে মানব উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এসব কেনাকাটার সঙ্গে জাতীয় অগ্রাধিকার কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, সম্ভবত প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল গুটিকয়েক ক্ষমতাধর ব্যক্তির 'ক্রেতা কমিশন'। প্রকৃত অর্থে ব্যপক বিস্তৃত দুর্বৃত্তায়ন ও মানব বঞ্চনার বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি সাধারণ কোনোও ভ্রান্তি নয় তা সম্ভবত গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত, জনগণের স্বার্থ বিরোধী ও সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক অসাম্য জিইয়ে রাখা এবং 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ' লালনের অন্যতম কৌশল মাত্র।

যৌথভাবে জন প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে স্বাধীন বাংলাদেশের সব সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিচারে সর্বনিম্ন হিস্যা ছিল ২৩.২ শতাংশ, ১৯৭৪/৭৫ অর্থ বছরে। ১৯৮৪/৮৫ অর্থ বছরে ঐ

ব্যয়ের হিস্যা সর্বোচ্চ ৪১.২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। পুরো আশির দশকেই প্রশাসন ও নিরাপত্তা খাতে সরকারি রাজস্ব ব্যয় সাধারণভাবে বেশি ছিল। নব্বইয়ের দশকে এই দু'টো খাতে রাজস্ব ব্যয় ধীরগতিতে কমার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এখন বাজেটে তা ২৬.৮ শতাংশে (২৮,৯৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৭৭৫৫ কোটি টাকা) এসে দাঁড়িয়েছে। যুগোপযোগী প্রশাসনিক সংস্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তির (বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির) সহায়তায় এ-দু'টো খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে ১৫ শতাংশ হ্রাস করে শিক্ষার বরাদ্দ বৃদ্ধি সম্ভব।

জন প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তৃতি ও দক্ষতা-নির্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:

- গত তিন দশকে মধ্যে ২৭ বছরই জন প্রশাসন খাতটি ছিল রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাত,
- ১৯৭৫ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে,
- স্বাধীনতার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ২ শতাংশ অথচ সাধারণ প্রশাসনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ (বর্তমানে ৩৯টি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগসমূহে প্রায় ১২ লাখ চাকুরে),
- সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হবে প্রশাসনের বেতন-ভাতা হিসাবে।

গত তিন দশকে বাংলাদেশে শাসক দলের রাজনীতিকবৃন্দ, সামরিক আমলাতন্ত্র, সিভিল আমলাতন্ত্র এবং বিকাশমান মুৎসুদ্দী পুঁজির যে 'গ্রান্ড এলায়েন্স' কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতির সিস্টেম ও কাঠামো গড়ে উঠেছে, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে উন্নয়নে সুশাসন বা 'governance' ইস্যুকে কেন্দ্রিয় গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজি লুণ্ঠনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সফলভাবে অপপ্রয়োগের এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে বলা চলে। অতএব, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের বিস্তার রোধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে নয়, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং তথাকথিত 'সিস্টেম লস' নিরসনের উদ্দেশ্যে। আমলারা প্রকৃত অর্থে পাবলিক সার্ভেন্ট (public servant) নয়, বরঞ্চ public-ই আমলাদের servant। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে আমলাতন্ত্রের মধ্যস্থতায় দুর্নীতির কালো পথে পাচার করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এজেন্টরা বিদেশি দাতা চক্র, এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, এবং ঋণখেলাপি চক্র। এই আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে হলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা কিভাবে কার্যকরভাবে বাড়ানো যাবে, সে সম্পর্কেও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

সুস্থ ও শিক্ষিত মানব ভিত্তি ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়– এ কথা সবাই স্বীকার করেন। এ দিক থেকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতটি মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রধান খাত। মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ এ খাতটিকে উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার কাজটি যথেষ্ট মাত্রায় এগিয়ে গেছে। সরকারই বলছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতে মাথাপিছু ১২ ডলার ব্যয় হওয়া উচিত অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৩০-৩৫ ডলার অথচ সরকারি খাত থেকে ব্যয় হচ্ছে মাথাপিছু বছরে মাত্র ৩-৪ ডলার। মোট বাজেটের কোনও বৃদ্ধি ছাড়াই খাতওয়ারি বরাদ্দের অগ্রাধিকার বিন্যাস মানব-মুখী করলেই যে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১২ ডলারে উন্নিত করা যায়, তা সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেব।

বাস্তবতা হ'ল ঐ সাধারণ বোধ্য পাটিগাণিতিক হিসেবে দেশ চলছে না। মূল কথা হল, চৌদ্দ কোটি মানুষের বাংলাদেশে নয় কোটি মানুষই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বঞ্চিত। ইদানিং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (Diseases of Poverty) (দারিদ্রের রোগ)-র আওতায় ৭-টি রোগের কথা বলছে। যার অন্তর্ভূক্ত হল যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের (যৌনবাহিত) রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন

(নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া ও হাম। আমদের দেশে এই সাতটি রোগের বোঝা মূলত দরিদ্রদের উপরই পড়ে। যে ৭০ ভাগ শিশু ও যুবক (young adult অর্থে) ঐ সব রোগে মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত; 'দারিদ্রের রোগে' মৃত্যু অথবা পঙ্গুত্বের কারণে দারিদ্রের দুষ্ট চক্রটি চলতেই থাকে; 'দারিদ্রের রোগ' এ মুহূর্তে দূর করতে না পারলে ভবিষ্যতে সরকার ও দরিদ্র পরিবার উভয়কেই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হতে হবে। আসলে শাসকগোষ্ঠি এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন না, কারণ যাদের জন্য নিজেদের বর্তমানই একমাত্র কাল, তারা সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে মানব কল্যাণের চিন্তা করবেন– এটা দূরাশা। অথচ দেশের সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য বিষয়টি দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম প্রধান কৌশল হওয়া উচিত।

আসলে স্বাস্থ্যখাতে 'দারিদ্রের রোগ' সম্পর্কে এসবই হল আমাদের আকাঙ্খার কথা। বাস্তবতা ভিন্ন। এ খাতে সরকারি ব্যয় লজ্জাজনকভাবে অপ্রতুল, যা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল দশা দেখে বোঝা যায়। ১৯৯২/৯৩ সালে ৭.৪ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় এ খাতে সর্বোচ্চ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল, যা এখন আবার ৫.৭ শতাংশে নেমে গেছে। সমাজের বিত্তশালী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকের আশ্রয় নিচ্ছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা এবং অসদাচারণের প্রতীক হয়ে বহাল রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শন চিকিৎসাকেও একটি লোভনীয় 'পণ্যে' পরিণত করেছে, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারনাঘাতের শামিল। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যও দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়েছে।

এক কথায় এটা আদৌ স্পষ্ট নয় যে বাজেট কিভাবে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন হ্রাস নিশ্চিত করবে; কিভাবে বুঝবো যে চলমান বাজেট অতীতের তুলনায় অধিকহারে উৎপাদনমূখী কর্মকাণ্ডে প্রণোদনা দিচ্ছে; কিভাবে বুঝবো যে বর্তমান বাজেট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যপক ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাস করবে; কি কৌশল আছে যা দিয়ে বুঝবো বাজেট মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা-দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা রাখবে? আসলে দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়া অর্থনীতিতে মানুষের জন্য বাজেট প্রণয়ন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মানবকল্যাণমুখী সংবিধান সম্মত "home grown" বাজেট সৃষ্টি (যে কথা আমাদের মন্ত্রীরা অনেকবার বলেছেন)।

সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে শিক্ষা: জনকল্যাণ যেখানে উপেক্ষিত

বাজেট উপস্থাপনের সময় গৎবাঁধা বুলি হিসেবে যদিও শিক্ষা খাতকে সরকারি ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ আসনটি প্রদানের ঘোষণা উচ্চারিত হয়ে চলেছে, তবু সত্য হলো, একদিকে যেমন শিক্ষা খাতে প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ অপ্রতুল, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা খাতকে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির শিকার করে রাখার দায়ভার স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিটি সরকারের ওপরই কমবেশি বর্তাবে। তবু বলতে হবে, ১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের ২১.২ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে বঙ্গবন্ধুর সরকার এ ব্যাপারে যে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছিলেন, পরে কোনোও সরকারই সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হননি। বরং রাজস্ব বাজেটে ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারটি একটি প্রতারণাপূর্ণ সংখ্যাতেত্বর মারপ্যাচ (number game)-এ পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই প্রতিরক্ষা খাতে প্রকৃত সরকারি ব্যয় শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চাইতে বেশি ছিল। ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরে শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের ব্যয় ছিল সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ৮.৭ শতাংশ, অথচ ঐ একই বছর প্রতিরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ২২.৭ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় রেকর্ড করা হয়েছিল। এ বছরে শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত রাজস্ব ব্যয় মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৪.৫ শতাংশ, যা জন প্রশাসন ব্যয়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম। রাজনৈতিক বক্তৃতামালা এবং কাজের মধ্যে ফারাক আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য এ কারণে যে, দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সরকার বিরাট সাফল্য দাবি করছে। ৬৫ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনের দাবি করা হয়। শিক্ষা খাতে তথাকথিত এই সাফল্যের দাবী প্রতারণার শামিল। অন্যদিকে সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার হুজুগে মেতে উঠেছে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যকে ঘোষিত শিক্ষা নীতির মাধ্যমে সমাজ জীবনে দৃঢ়মূল করার ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে শিক্ষা খাতে ব্যয়ে বাংলাদেশ

সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। UNESCO যেখানে জিডিপি'র ৮ শতাংশ শিক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী সদস্য দেশ হয়ে জিডিপি'র মাত্র ২.৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে সরকারিভাবে ব্যয় করে সাফল্যের বড়াই করাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যাভাষ্য মাত্র। বাংলাদেশে স্বাক্ষরতা অভিযান যে ভাবে চলছে তাতে করে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হলেও ৮০ ভাগ কার্যত নিরক্ষর থেকেই যাবে।

২০০৩-০৪ অর্থবছরে শিক্ষার উন্নয়ন বাজেট গত বছরের বাজেটের তুলনায় প্রায় ২৯০ কোটি টাকা কমেছে (সম্ভবত: বিদেশি সাহায্য এ খাতে হ্রাস পাবে বলে)। প্রাথমিক ও গণ-শিক্ষার বাজেট কমেছে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা। আমরা কি সবাই মৌলিক শিক্ষা পেয়ে গেছি যে কারণে প্রাথমিক ও গণ-শিক্ষার বাজেট কমছে। আমরা তো জানি ফলপ্রদ স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি পায় নি; দ্বিমত নেই যে সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। এমন কি সরকারি খাতে সবচে' প্রশংসিত দরিদ্র-মুখী কর্মসূচি “খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা” খাতে বরাদ্দের ৭৫% গরীবদের উপকারে আসেনি। যে কাঠামোতে “খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা” কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেটাই দরিদ্র-উদ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের ৭৫ ভাগ ধনীদের কাছে পৌঁছে দেই। তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে কার্যত: নিরক্ষর রাখাটাই লক্ষ্য। ২৭০৮ কোটি টাকার শিক্ষা বাজেটে এমন কি কৌশল ও কাঠামোগত রূপান্তরের উল্লেখ আছে যা দিয়ে বুঝবো দরিদ্রঘরের সন্তানেরা একটু গুণগত মানসম্মত শিক্ষা পাবেন?

গত বছরের উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় এ বছর উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ১১৫৯ কোটি টাকা (১৯,৬৬৩ কোটি টাকা থেকে ২০,৮২২ কোটি টাকা)। কিন্তু লক্ষণীয় যে গত বছরের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় কমছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতে, যার মধ্যে আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পানি সম্পদ (কৃষি), এবং পাট-বস্ত্র-বাণিজ্য (শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস); আর তা বাড়ছে যে সব খাতে সেগুলি হল জন প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা (দ্বিগুণ বাড়ছে), জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ। উন্নয়ন বাজেটের কাঠামোগত এ বিন্যাস কোনো অর্থেই জনকল্যাণ নির্দেশক নয়। উন্নয়ন বাজেটের কাঠামোগত এ বিন্যাসের সাথে অর্থমন্ত্রী বর্ণিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র নিরসনের সম্পর্ক কি?

এ দেশে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট বিবিধ ধারার যোগসূত্র সরাসরি ও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রের আনুপাতিক ব্যয় গত তিন দশকে কমেছে। সরকারি হিসেবে (যা বিশ্লেষণ না করে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না) ১৯৭২ সালে রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ২১.১৪ ভাগ ছিল শিক্ষাখাতে ব্যয়। গত কয়েক বছরে এটি শতকরা ১৪-১৫ ভাগের কাছাকাছি ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষাখাতের ব্যয় ১৯৭২ সালে ৯.৪৬ ভাগ থেকে এখন উল্লম্ফন দিয়েছে আনুষ্ঠানিক হিসেবে দ্বিগুণ, আর আমার হিসেবে কমপক্ষে তিনগুণ।

আর অন্যদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভেদে বিকাশের হারে ভারসাম্যহীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে শতকরা প্রায় ২০০ ভাগ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে শতকরা ৮০০ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী একই সময়ে বেড়েছে শতকরা ২০০ ভাগ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে শতকরা ১৩০০ ভাগ। শিক্ষাখাতে মাথাপিছু বার্ষিক সরকারি মোট ব্যয় ২৮৮ টাকা। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৩০০০ টাকা, বেসরকারি খাতে প্রায় ৯০০ টাকা। অন্যদিকে সরকারি মাদ্রাসা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৫০০০ টাকা। বেসরকারি খাতে ১০৬২ টাকা। ক্যাডেট কলেজে এই ব্যয় আরও অনেক বেশি: ১৯৮৫ সালের হিসেবে এটি ছিল সাধারণ কলেজের মাথাপিছু ব্যয়ের তুলনায় ২০ গুণ এবং মাধ্যমিক স্কুলের তুলনায় ৫০ গুণ বেশি। ক্যাডেট কলেজে ব্যয় শিক্ষাখাত থেকে গেলেও আগেই বলেছি তা নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

আরো একটি বিষয় না বললেই নয়- তা হল এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার করুণ দশা। দেশের ৮৭.৫% স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী পাঠ উপকরণ নেই। ৮১.৩% স্কুলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই। আর গবেষণাগার

নেই ৯৪% স্কুলে। ১৯৯০ সালে এইচএসসি-তে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিলো মাত্র ২৪.৬৯%। ১৯৯৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৬৯%। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তো ২৫% শিক্ষার্থী, এখন তা ৫%-এর নিচে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রচার মাত্র ১.৬৫%, যেখানে বিদেশি ছায়াছবি ও ভিডিও টেপ প্রদর্শনীর হার ২১%। ২০০৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ৩২.৭৪%, ডিগ্রি পরীক্ষায় ১০.১২%, ২০০৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ২৪.৪৩%। উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি ও অনার্স-মাস্টার্সে বিজ্ঞান পড়ানো হয় এমন কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকের ঘাটতি প্রায় ৫০%। এই যখন বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থা, তখন দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠবে কিভাবে? অথচ চীনারা কিন্তু ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যে সামনের ১০-২০ বছরে তাদের দেশে কতজন কোন কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পাবেন।

১৯৯০-এর দশকে এ দেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে ১.৬৩ গুণ (সারণি ৩৪): প্রাথমিক স্তরে ১.৩ গুণ, মাধ্যমিক স্তরে ১.৭ গুণ, কলেজে ৮.৬ গুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১.৫ গুণ। আর একই সময়কালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ১.৫২ গুণ (সারণি ৩৪): প্রাথমিক স্তরে ১.৩ গুণ, মাধ্যামিক স্তরে ২ গুণ, কলেজে ২.৩ গুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪.৫ গুণ। কিন্তু এর পাশাপাশি শিক্ষাখাতে ভিত্তিস্তরের স্বল্প ব্যয় বরাদ্দে বিশেষ কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি (সারণি ৩৫)। গত ১০ বছরে এ দেশে শিক্ষা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট খাতে (যে হিসেবে অনেক মারপ্যাচ আছে) মোট সরকারি ব্যয় বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটসহ) বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ যেখানে রাজস্ব বরাদ্দ বেড়েছে ২.১ গুণ আর উন্নয়ন বরাদ্দ বেড়েছে ১.৮ গুণ। আসলে ১০ বছরে মূল্যস্ফিতির হিসেব কষলে দেখা যাবে যে প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ বাড়েনি- স্বল্প বরাদ্দ স্বল্পই রয়ে গেছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে গত ১০ বছরে মোট বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ-ভাগ আসলে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরের ১৬.৮ শতাংশ থেকে ২০০৩/০৪ অর্থবছরে ১৩.৯ ভাগ (সারণী ৩৫)। এ ব্যয় বরাদ্দ অধিক হারে কমেছে রাজস্ব বাজেটে (যার অধিকাংশই শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক আর্থিক সুযোগ সংশ্লিষ্ট): ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে রাজস্ব বরাদ্দ ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৯ শতাংশ, তা ২০০৩/০৪ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.৫ শতাংশে; অনুরূপ উন্নয়ন বরাদ্দও কমেছে ১৪.৬ শতাংশ থেকে (১৯৯৪/৯৫) এখন ১৩ শতাংশে (২০০৩-০৪)। আরো পীড়াদায়ক যা শিক্ষা বিষয়ে সরকারের অনীহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তা হল একদিকে দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান কিন্তু শিক্ষকরা (সকলস্তর একসাথে ধরলেও) বেতন ভাতাদিসহ ১৯৯৩/৯৪ সালে (রাজস্ব বাজেটের হিসেবে) যখন মাসে পেতেন প্রায় ৩৮০০ টাকা সেখানে ২০০০ সাল নাগাদ পরিমাণটা হয়েছে মাত্র ৪৫০০ টাকার সমপরিমাণ। অর্থাৎ প্রায় ৭ বছরে বেড়েছে গড় মাসিক ৭০০ টাকা। অথচ এ সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে কমপক্ষে দ্বিগুণ। এক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেই যে ১৯৯৩/৯৪-এ মাসিক ৩৮০০ টাকা ঠিক ছিল (যা আদৌ ঠিক ছিল না) তাহলে ২০০০ সাল নাগাদ মাসিক গড় বেতন-ভাতা হওয়া উচিত ছিল ৭৬০০ টাকা (৪৫০০ টাকা নয়)। এক কথায় শিক্ষাখাতের সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের চিত্রটি সরাসরি নির্দেশ করে যে সরকার মোটামুটি কখনও শিক্ষা-শিক্ষক নিয়ে সিরিয়াস নন; শিক্ষার সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন; এবং সরকার সম্ভবত: শিক্ষার সাথে জনকল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্বাসও করেন না। শিক্ষাখাতের বেহাল অবস্থা এবং ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণ থেকে "শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন" তখনই সম্ভব হবে যখন (অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে) শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকারি রাজস্ব ব্যয়-বরাদ্দ ১৩ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে উন্নিত করা হবে, এবং উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ ১৪ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে উন্নিত করা হবে। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকারি মোট ব্যয় বরাদ্দ ৬,৮৯৬ কোটি টাকা থেকে ১৩,৩৫০ কোটি টাকায় উন্নিত করা হবে এবং নিশ্চিত করা হবে ঐ বরাদ্দ নিচ্ছিদ্রভাবে সময়মতো জায়গামতো পৌঁছুবে।

সারণি ৩৪: বাংলাদেশে শিক্ষক এবং ছাত্র: ১৯৭২-২০০১

বছর	শিক্ষক					ছাত্র				
	প্রাথমিক (গভঃ)	মাধ্যমিক	কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়	মোট	প্রাথমিক (গভঃ)	মাধ্যমিক	কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
১৯৭২-৭৩	১৫৫৭৪২	৭৫৩৪২			২৩১০৮৪	৭৭৫৮০০০	১৮৪১০০০	৩৮৬২৫০	২৬৩৯০	১০০১১৬৪০
১৯৭৩-৭৪	১৫০২৬৭	৭৪৯২৪			২২৫১৯১	৭৮৪৮০০০	১৮২৩০০০	৪২১১১৪	২৯৯৬৬	১০১২২০৮০
১৯৭৪-৭৫	১৬৪৬১৭	৭৯৩৪২			২৪৩৯৫৯	৮৩৫০০০০	১৯৬৪০০০	৩৮০৯৫৩	৩৩৩০৮	১০৭২৮২৬১
১৯৭৫-৭৬	১৭২৪৪৮	৮৫৪৬১			২৫৭৯০৯	৮২৮৯০০০	১৯৫৯০০০	২৮৮৭০৭	২৬০৬১	১০৫৬২৭৬৮
১৯৭৬-৭৭	১৭৪৩৮৪	৮৩৯৫৫			২৫৮৩৩৯	৮৪১৮০০০	১৮৩৩০০০	২৮৮৭০৭	২৫০৩৪	১০৫৬৪৭৪১
১৯৭৭-৭৮	১৭১০২৪	৮৬৫৬৩			২৫৭৫৮৭	৭৫৫৭০০০	২৩৩৯০০০	৩৩৬৪০৩	২৮৪৮৬	১০২৬০৮৮৯
১৯৭৮-৭৯	১৭২৭৮১	৮৭৪০৪			২৬০১৮৫	৭৭৩৩০০০	২৩৬৯০০০	৩১৪৯৬১	৩০৬৯৯	১০৪৪৭৬৬০
১৯৭৯-৮০	১৭৪১৬১	৮৮৩৫১			২৬২৫১২	৮০২৭০০০	২৪০৫০০০	২৩৮৫৮০	৩৬৫৩০	১০৭০৭১১০
১৯৮০-৮১	১৭৪৪৪৭	৮৮৮৭৩	৪৬৪৯		২৬৭৯৬৯	৮২৬০০০০	২৪৬৭০০০	২৪০২০৭	৩৭০১৮	১১০০৪২২৫
১৯৮১-৮২	১৭৫৮৭১	৯০৭৯৪	৪৬৯৮		২৭১৩৬৩	৮৬৫৬০০০	২৫৪৬০০০	৩৭৯৫৪২	৩৯৬৯৯	১১৬২১২৪১
১৯৮২-৮৩	১৭৮৫৮৯	৯২৬৬৪	৪৭৭৩		২৭৬০২৬	৮৯৫৫০০০	২৫৭০০০০	৩৯৬১০৯	৩৭০৭৮	১১৯৫৮১৮৭
১৯৮৩-৮৪	১৮৩১৭৩	৯৫২৭৫	৪৯৫৮		২৮৩৪০৬	৯৬৪৩০০০	২৬০৮০০০	৪১৬৭৭৭	৩৫৩৮৫	১২৭০৩১৬২
১৯৮৪-৮৫	১৮৩৬৩৮	৯৭৭৭৪	৫৯৫৮	২৬৫৫	২৯০০২৫	১০০৮২০০০	২৬৩৮০০০	৫১৫৫৪১	৩৫৪৯৩	১৩২৭১০৩৪
১৯৮৫-৮৬	১৮৪৬৬৮	৯৯০১৬	১৭২১৫	২৫৭৪	৩০৩৪৭৩	১০৭৭৬০০০	২৭৪৫০০০	৬০৩৯১৫	২৭৪৮৭	১৪১৫২৪০২
১৯৮৬-৮৭	১৮৮৩৬৯	১০০৮৬৫	১৮৭৫০	২৫৯৫	৩১০৫৭৯	১১২৬৩০০০	২৯৬২০০০	৬৬৭৮৭৩	৪০৭৩৯	১৪৯৩৩৬১২
১৯৮৭-৮৮	১৮৯১৯১	১০২১৯৬	৭২৭৫	২৮২০	২৯৮৬৬২	১১৭৫৫০০০	৩১৪৪০০০	৭০৫৪১২	৪১২৫৫	১৫৬৪৫৬৬৭
১৯৮৮-৮৯	১৯২৮১৬	১০৪৭২৪	৬৫৫০	২৯১০	৩০৪০৯০	১১৭৭৪০০০	৩৪১৭০০০	৬৮৭৩০৩	৪৬৬৫৯	১৫৯২৪৯৬২
১৯৮৯-৯০	২০০০৫৬	১০৭০৩৩	৬৮২৮	৩১২২	৩১৩৯১৭	১২৩৪৫০০০	৩৫২৫০০০	৬৯০৪৪০	৪৭৮০৩	১৬৬০৮২৪৩
১৯৯০-৯১	২০২৮৪৭	১১০৩১৩	৭৮৯৯	৩২৩০	৩২১০৫৯	১৩০৩৫০০০	৩৬৬২০০০	৭৬৭৩৮৫	৫২৬২০	১৭৫১৭০০৫
১৯৯১-৯২	২০৮২৭১	১১৬৩৩৬	২৫১৯৫	৩৩১১	৩৫৩১১৩	১৩৭১৭০০০	৪০০৯০০০	৮৫৩৩৪৩	৫২৭২২	১৮৬৩২০৬৫
১৯৯২-৯৩	২১৪৭৭৯	১২৯৬৫৫	২৪৪৬৫	৩৪৩২	৩৭২৩৩১	১৪২০২০০০	৪৬৭৩০০০	৯১২৯৮৫	৬৩০০৬	১৯৮৫০৯৯১
১৯৯৩-৯৪	২৪২২৫২	১৩৫২১৭	৮৮৫৪	৩৫৪০	৩৮৬৩২৩	১৫১৮৫০০০	৪৮৮৪০০০	১০৩২৬৩৫	১১৭৩৫৯	২১২১৮৯৯৪
১৯৯৪-৯৫	২৪৮৭৮৩	১৪৮৮৭৮	৭০৩২৫	৩৯২৭	৪৭১৯১৩	১৬৪২৯০০০	৫৫৩১০০০	২৩৮৮৫৫১	১৩৪৮১৩	২৪৪৮৩৩৬৪
১৯৯৫-৯৬	২৪৯৭১৫	১৫৬২৮৭	৫৭০৭৮	৪০১৫	৪৬৭০৯৫	১৭০৬৮০০০	৫৭৮৮০০০	২৫০২৬০৩	৬৬০৭৫	২৫৪২৪৬৭৮
১৯৯৬-৯৭	২৪৯৯২৮	১৫৬১৩৭	১৮৯৬৫	৪২৯০	৪২৫০৩০	১৭৩১৯০০০	৫৯৫৭০০০	২৫৭৩৪৩৯	৬৭২৮২	২৫৯১৬৭২১
১৯৯৭-৯৮	২৫০৯৯০	১৬১১৪১	৮২১৮০	৪৩৩৪	৪৯৮৬৪৫	১৭৬২৭০০০	৬২৮৯০০০	২৭১৩৫৪৮	৬৭১৪৫	২৬৬৯৬৬৯৩
১৯৯৮-৯৯	২৭৮৯৯২	১৬৯৯৮৯	৫৭২৯৩	৪৪৬৯	৫১০৭৪৩	১৯৬১২০০০	৬৬৮০০০০	১৬২২৪১২	৭০১৪৫	২৭৯৮৪৫৫৭
১৯৯৯-০০	২৫৯৪৪১	১৮০১২৪	৭১০৪১	৪৬২৭	৫১৫২৩৩	১৭৩৭৮০০০	৭১১৩০০০	১৭০২৮৫৫	২৩৪২৩৬	২৬৪২৮০৯১
২০০০-০১	২৬৪৫০২	১৮৭৭০৭	৬৭৬৮০	৪৮৯৭	৫২৪৭৮৬	১৭৪৫৬০০০	৭২৮৮০০০	১৭২৭৫১৮	২৫১৪১৩	২৬৭২২৯৩১

উৎস: বিভিন্ন সনের সরকারি তথ্য

সারণি ৩৫: শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ: ১৯৮০-২০০৪

বছর	রাজস্ব		উন্নয়ন		মোট বাজেট	
	শিক্ষা মোট রাজস্বের % হিসাবে	শিক্ষা (মিলিয়ন টাকায়)	শিক্ষা—মোট উন্নয়নের % হিসাবে	শিক্ষা (মিলিয়ন টাকায়)	শিক্ষা—মোট বাজেটের % হিসাবে	শিক্ষা (মিলিয়ন টাকায়)
১৯৮০-৮১	১৫.৮৪	২০৯৯	২.৫৬	৬৩১.৬৯	৭.২০	২৭৩০.৬৯
১৯৮১-৮২	১৪.২১	২৩৪৯	৩.২৪	৮২৮.৩১	৭.৫৫	৩১৭৭.৩১
১৯৮২-৮৩	১২.৬৯	২২৭৫	৪.১৬	১০০৯.৫১	৫.৪৫	৩২৮৪.৫১
১৯৮৩-৮৪	৯.০১	১৭৭৭	৪.২৯	১২৭৬.৪৮	৬.১৭	৩০৫৩.৪৮
১৯৮৪-৮৫	১৭.৩৭	৪৪৭০	৩.৪২	১১৯১.৩৬	১৩.৭২	৫৬৬১.৩৬
১৯৮৫-৮৬	১৭.৫৮	৬০১২	৩.৪৪	১৩৯৭.৯৬	১০.৯০	৭৪০৯.৯৬
১৯৮৬-৮৭	১৮.৬৬	৬৯৭৯	৫.৩৩	২০৫৩.২৭	১১.৯০	৯০৩২.২৭
১৯৮৭-৮৮	১৮.৭৮	৮৮২০	৫.৮৭	২৩৭৫.৮১	১২.৮০	১১১৯৫.৮১
১৯৮৮-৮৯	১৫.৩৮	৯৪৯২	৪.৭৮	২২১৩	১০.৮৪৬	১১৭০৫
১৯৮৯-৯০	১৪.০৭	৯৭০৯	৫.২২	২৯৮২	১০.০৬	১২৬৯১
১৯৯০-৯১	১৬.০৬	১১৬০৯	২.১১	১১১০	১০.১৮	১২৭১৯
১৯৯১-৯২	১৭.৪৬	১৩৬০৮	২.৫২	১৫২১	১০.৯৫	১৫১২৯
১৯৯২-৯৩	১৯.০৯	১৬৪১৩	১.১৪	৭৪৫	১১.৩৩	১৭১৫৮
১৯৯৩-৯৪	১৯.২০	১৭৫৬৮	৭.৮৫	৭০৫০	১৩.৫৮	২৪৬১৮
১৯৯৪-৯৫	১৯.১১	১৯৭১৬	১৪.৫৫	১৪৯৯২	১৬.৮৩	৩৪৭০৮
১৯৯৫-৯৬	১৭.৬৭	২০৯৭৮	১৪.৬০	১৪৬২৩	১৬.২৬	৩৫৬০১
১৯৯৬-৯৭	১৮.০৩	২২৯৭০	১৪.০৪	১৫৫০৭	১৬.১৮	৩৮৪৭৭
১৯৯৭-৯৮	১৮.১১	২৬৮৯১	১৩.৯৭	১৫৪১৬	১৬.৩৪	৪২৩০৭
১৯৯৮-৯৯	১৭.৫৮	২৯৬৮০	১৩.৯০	১৭৩৯০	১৬.০২	৪৭০৭০
১৯৯৯-০০	১৭.৫৩	৩২৫৬৮	১৩.৩৪	২০৬৪০	১৫.৬২	৫৩২০৮
২০০০-০১	১৭.৩৬	৩৫৮৭৫	১৩.৯৮	২২৫৭৫	১৫.৮৮	৫৮৪৫০
২০০১-০২	১৬.৫০	৩৬৩৫৪	১৪.০৮	১৯১৪৩	১৫.৫৭	৫৫৪৯৭
২০০২-০৩	১৬.১৭	৩৮৭৬০	১৫.২৩	২৯৯৫০	১৪.১১	৬৮৬২০
২০০৩-০৪	১৪.৪৬	৪১৮৮০	১৩.০০	২৭০৮০	১৩.৮৫	৬৮৯৬০

উৎস: বিভিন্ন সনের সরকারি তথ্য

পাবলিক উচ্চ শিক্ষার আদমজীকরণ হচ্ছে

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়-এর ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যবসাটি আমার কাছে একটি ‘ভদ্রলোকি’ (sophisticated) দুর্বৃত্তায়ন বলে মনে হয়। অনেকটা ঢাকার চার পাশের জমি জমার মত, যেখানে জমির দর-দামের সাথে প্রকৃত মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রের মূল্যতত্ত্ব এটা বিশ্লেষণে অপারগ। কৃত্রিম উচ্চ মুনাফা (artificially high profit) মূল বিষয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দর-দাম কোনো ধরণের মূল্যতত্ত্ব, বেতন কাঠামো ও জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়টি জমি-জমা (স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি)-র থেকে মারাত্মক। কারণ কথা হচ্ছে জ্ঞান-জগত নিয়ে।

উচ্চ শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষাই এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা এখন সরাসরি ব্যবসায়িক পণ্য। আর এ পণ্যের বাজার স্বদেশে কতটুকু বিস্তৃত তা কিন্তু খুব একটা জানা নেই। তবে গোলকায়িত অর্থনীতিতে মনে করা হচ্ছে বাজার স্বল্প বিস্তৃত নয়। পণ্যায়নকৃত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজার-অন্ধত্ব এখন নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি (উচ্চ শিক্ষার্থির সংখ্যাসহ) সম্ভবত: প্রধানত উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণেই ঘটছে। আর এ ব্যর্থতা সৃষ্টিতে– প্রকারান্তরে মুনাফা ভিত্তিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে– প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সরকার পরিচালনাকারী আমলা-রাজনীতিক-ব্যবসায়ী ত্রিচক্র। আজকাল কালোটাকার মালিকেরাও কেন যেন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। সম্ভবত:

মুনাফার সাথে সাথে সামাজিক পরিচিতি (কু-পরিচিতি পরিবর্তন) স্থাপনও একটা উদ্দেশ্য। মালিক কিন্তু জানেন আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ কমপক্ষে ২ লাখ অতিসম্পন্ন (ধনী) পরিবারের সন্তান সন্তাদিরা প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ তাদের পছন্দসই উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে জায়গা পাবে না। ধনীর সন্তান অথচ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রহিত হবে- একথা তো মানা যায় না। সুতরাং উচ্চ শিক্ষাত্তোর কি হবে সেটা বিচার্য নয়, ধনীদের জন্য মূল বিষয় হ'ল— যেভাবেই হোক একটা উচ্চতর ডিগ্রি পেতেই হবে।

পাবলিক উচ্চ শিক্ষা খাতের ক্ষয় আর লয় প্রাপ্তির সাথে প্রাইভেট উচ্চশিক্ষা খাতের প্রসার সমানুপাতিক। আবার এ কথাও সত্য যে প্রাইভেট উচ্চ শিক্ষা অথবা প্রাইভেট স্বাস্থ্য যেটাই হোক তাদের প্রচার ও প্রসারে মূল বাহক হ'ল পাবলিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরাই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবসা জমাতে নাম ব্যবহার করতে হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের (প্রাক্তন উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ বর্তমানে কর্মরত অথবা ছুটিতে আছেন এমন অনেক অধ্যাপক)। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবি অথবা সংকীর্ণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন অধ্যাপকদের নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যলয় কিন্তু এক ধরণের ভর্তুকি পেয়ে যাচ্ছে: ভর্তুকিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক— উভয়ই। বিষয়টি নিরেট বাজার কেন্দ্রিক। বাজারই প্রধান। আর বাজারটি এমনই যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ও ব্যবসা প্রশাসন-এর চাহিদা থাকবে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন থাকবে না। যেমন দর্শন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী দেয়া হবে না। অবশ্য বাজার থাকলে এসব বিষয়েও উচ্চমূল্যে ডিগ্রী বিক্রি করা হবে। তবে প্রকৃত জ্ঞানের বাজার বাজার-অর্থনীতিতে তুলনামূলকভাবে সীমিতই থাকবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল-স্বল্পবিত্ত-দরিদ্রদের স্থান নেই। থাকারও কথা নয়। ব্যবসা-নীতির হিসেবে সেটার প্রয়োজনও নেই। সরকারি হিসেবেই তো দেশে পারিবারিক আয়-কাঠামোতে ধনী-দরিদ্রদের বৈষম্য বাড়ছে। জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ৫% ধনীরা মোট পারিবারিক আয়ের ৩১%-এর মালিক (কালো আয় যোগ করলে পরিমাণটা ৫০% হতে পারে)। দেশের ১০-১২ লাখ এসব ধনী পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা –বাজারটা যথেষ্ট বড়। সুতরাং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে একটু মান সম্মত (মান-এর সংজ্ঞা যাই হোক না কেন) পাঠ-দান নিশ্চিত করতে পারলেই ব্যবসায়িক মুনাফা সর্বোচ্চ করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।

প্রশ্নটা সরাসরি এমনভাবে করা যেতে পারে— তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কি আদমজী হবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা চাইবেন না, কিন্তু উচ্চ-শিক্ষা ব্যবসায়ীসহ (যাদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন) যারা মুক্ত-বাজার নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর (সংবিধান সেক্ষেত্রে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়)- তারা সেটাই চাইবেন। এর পেছনে কয়েকটা কারণ থাকতে পারে:

১। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ (অত্যুচ্চ কৃত্রিম মুনাফা, সামাজিক ও আর্থিক ভর্তুকি)

২। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা অধিকতর স্বাধীনতাকামী (এ দেশের জনকল্যাণকামী সকল আন্দোলনের-স্বাধীনতা সংগ্রামসহ— উৎসস্থল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়; অথবা রাজনৈতিক সচেতনতা বহিঃপ্রকাশের সুবিধা আছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নিয়ে আমার আত্মতুষ্টি নেই, তবে একথা তো সত্য যে মধুর ক্যান্টিন বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়)

৩। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের জ্ঞান চর্চ্চার পরিসর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

প্রাইভেটের তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সবচে' নিরুৎসাহিত হবার কারণ (demotivating factor) হ'ল বেতন কাঠামো। বিষয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাধীনতা-চেতনা বিলুপ্তির সহায়ক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে হলে তুলনামুলক অধিক মেধাবি হতে হবে কিন্তু

বেতন হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় গড়ে প্রায় পাঁচগুণ কম (সারণি ৩৬)। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক অধিক মেধা সম্পন্ন শিক্ষকদের বেতন প্রাইভেটের সমান করলে (যদিও মান বিচারে তা সমান নয় অধিকই হওয়া উচিত) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়াতে যাবেন না। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর মনোযোগী হবেন, আর অন্যদিকে শিক্ষকের অভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিপদে পড়বে। কিন্তু মুক্ত-বাজারে উচ্চ শিক্ষার কলকাঠি যারা নাড়ছেন তারা সেটা হতে দেবেন না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

সারণি ৩৬: প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন পদে গড় মাসিক বেতন-ভাতা (টাকা)

পদ	প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাইভেট পাবলিকের তুলনায় কতগুণ বেশি
অধ্যাপক	৭৫,০০০-১৫০,০০০	১৫,০০০	৫.০-১০.০
সহযোগী অধ্যাপক	৫০,০০০-১০০,০০০	১০,০০০	৫.০-১০.০
সহকারী অধ্যাপক	৩৫,০০০-৫০.০০০	৭,৫০০	৪.৭-৬.৭
প্রভাষক	২৫,০০০-৫০.০০০	৫,০০০	৫.০-৮.০
গড়	৪৬,২৫০-৮৫,০০০	৯,৩৭৫	৪.৯-৯.১

তথ্য উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন কাঠামোর গড়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ (অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আপাততঃ আলোচনা করা হ'ল না)। আমার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যদি গড়ে ৪০ বছর শিক্ষকতা করেন (অবসরে যাবেন ৬৫ বছর বয়সে, যদি তাঁর আগে মারা না যান), যদি তিনি তিন সন্তানের জনক/জননী হ'ন এবং মোটামুটি ভদ্রস্থ খাওয়া-পরাসহ নিজ সন্তান-সন্তদিদের (আমাদের সমাজে অনেকেরই আত্মীয় স্বজন দেখতে হয়) নিজের জীবদ্দশায় বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন (সৌভাগ্যবান হলে) তাহলে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে তার ৪০ বছরে মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, কিন্তু তিনি আয় করবেন ৭০ লাখ টাকা (পেনশনসহ)। অবসর-এর পরে তার কোনো নিজস্ব বাসস্থান থাকবে না। অর্থাৎ ৪০ বছরে ঘাটতি ৯৮ লাখ টাকা তিনি কোথায় পাবেন? শিক্ষক-মানুষ চুরি করবেন না বা ঘুষ খাবেন না সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কিভাবে এ ঘাটতি মিটাচ্ছেন:

প্রথমত: অনেকেই কষ্ট করছেন; ভদ্রস্থ জীবন ধারণ করতে পারছেন না; কোনো মতে টানা-পোড়েনের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন (অনেকেই তো গ্রাম থেকে ধান-চাল বিক্রি করে মাসিক আয়ে যুক্ত করছেন);

দ্বিতীয়ত: কেউ কেউ ঘাটতি মিটাতে আয়ের বিকল্প উৎস হিসেবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন, অথবা যোগ্যতানুযায়ী গবেষণাধর্মী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় করছেন।

তৃতীয়ত: সম্ভবত: খুব কম সংখ্যক শিক্ষক আছেন যারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আয় করছেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কথা হ'ল এদেশে জ্ঞান চর্চার মূল পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীরা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রের বর্ধিত মনোযোগ দাবি করতে পারেন। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রেরও নৈতিক দায়িত্ব হবে এ দাবি যথাসাধ্য পূরণ করে এ দেশে প্রকৃত জ্ঞান-চর্চার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। সংকীর্ণ গণ্ডির প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ মুনাফা করে প্রকৃত জ্ঞান-জগতের

বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণার সাথে বিরোধাত্মক। রাষ্ট্র পরিচালকদের উভয় বিষয়ই গভীরভাবে ভাবতে হবে।

তাহলে হয়েছে কি আর করণীয় কি?

এক কথায় সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত তিন দশকে উক্ত ব্যয় বরাদ্দে মানব উন্নয়ন বিষয়টি কখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় গুরুত্ব পায়নি। দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে তা সম্ভব নয়। উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয়ের সিংহভাগই অনুৎপাদনশীল খাত চিরস্থায়ীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, আর মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে হয় নি; মানব উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন উপলক্ষ্য মাত্র। বরাদ্দ কাঠামো বিশ্লেষণে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য স্বল্প বরাদ্দ, আর সংখ্যলঘিষ্টের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ'– এরকমটি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারি ব্যয় বরাদ্দে (উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয় বাজেটে) কাঠামোগত রূপান্তর প্রয়োজন। রূপান্তর প্রয়োজন ব্যয়-বরাদ্দ পরিচালনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও। রূপান্তর প্রয়োজন জনগণের অপার শক্তির প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। রূপান্তর প্রয়োজন রাজনীতিবিদদের জনগণের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস ও মমত্ববোধের ক্ষেত্রে। এ সবই স্পষ্টতই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্ন।

গত তিন দশকে এদেশে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একটি বৈপরীত্য ও চরম ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গুটি কয়েক ক্ষমতাধর মানুষ সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্তায়িত করেছেন। তারা সর্বশক্তিমান। তারা উল্টো পথের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। গণদারিদ্র তাদের জন্য আশীর্বাদ। গত তিন দশকে বিকাশধারা ক্ষমতাধরদের জন্য একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ সৃষ্টি করেছে। যেখানে, ক্ষমতা স্থায়ীকরণ = ব্যাপক দাতা-তোষণ + ব্যাপক দুর্বৃত্ত-পোষণ + গণ-নিপীড়ন (জন কল্যাণের বুলির সহায়তায়)। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (ক্ষমতাহীন) মানুষ গত তিন দশক ধরে জীবনজীবীকা পরিচালনে যেভাবে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সে জন্য তাদের সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সৃজন ক্ষমতা ও সততায় মুগ্ধ হতেই হয়। প্রশ্ন হ'ল স্বাধীনতা চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা বিপরীতধর্মী এই সমীকরণ কি চিরস্থায়ী হতে পারে? ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই বিশ্বাস জাগে যে, বিকাশ প্রবণতার চাকাটি এখন যে পথে ঘুরছে তা উল্টো দিকে ঘুরবে– তা-ই অনিবার্য। সমাজ রূপান্তরের এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বড় মাপের রাজনৈতিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। তা কবে, কখন, কিভাবে ঘটবে, তা-ই দেখার বিষয়। সম্ভবত সামনে রয়েছে আরও একটা সংগ্রাম প্রক্রিয়া– যা নিশ্চিত করবে জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর ফাঁদ থেকে উত্তরণ ব্যতীত মহাবিপর্যয় রোধের উপায় নেই। বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। জনকল্যাণমুখী এই উত্তরণের প্রধান পূর্বশর্ত এক ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা, যে পরিবর্তনে সম্মিলন ঘটাতে হবে উষ্ণ হৃদয়, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ (substantive public actions)। এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক রূপান্তরই টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও মানবকল্যাণমুখী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ করতে সক্ষম।

সমগ্র বিষয়টি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ, তাও ঠিক নয় বলে মনে করি। উত্তরণে জ্ঞান-ভিত্তিক যে কর্মকাণ্ড প্রয়োজন, সেখানে আছে বিরাট দুর্বলতা। আসলে বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন বিশ্বকে পাল্টাচ্ছে। ওলট-পালট হচ্ছে। আমরা পাল্টাচ্ছি। পাল্টাচ্ছে নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী, কালো টাকার মালিক। সাধারণ মানুষও আগের মত নেই। একমেরুর বিশ্ব দখল করতে চায় অন্য সকলের সম্পদ ও বাজার। আমার ধারণা জটিল সমীকরণের এসব বিষয় চিন্তা ও বিশ্লেষণে আমাদের পূর্ণ মাত্রায় গলদ আছে। আমরা পরিবর্তন, রূপান্তর-এর যে কথা বলছি, তার কৌশল কি হবে? সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে Paradigm shift প্রয়োজন। সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের inherent অক্ষমতা ও চিন্তার দৈন্য আছে। ঐ shift নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হবে সত্যকে নির্মোহভাবে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা অর্জন। আশার কথা, এ দেশের

সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে এক ধরণের আত্মানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা, ছলনা, দোদুল্যমানতা, সত্যানুসন্ধানে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব, বৈপরীত্য, বিচ্যুতি। তবে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা কম হলেও আছে। এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে নতুন জ্ঞান-ভিত্তি সৃষ্টি হবে। যে ভিত্তিতে গভীর মূল্যায়ন ভিত্তিক চয়নের স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। সুতরাং নির্মোহ সত্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর সেই আবিষ্কৃত সত্য যত রূঢ়ই হোক, তাকে গ্রহণ করার মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। দুই-ই নিঃসন্দেহে একটা বড় মাপের জ্ঞান-শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সৃজনশীল কর্মকাণ্ড।